Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কাণ্টীয় যুক্তিভিত্তিক নৈতিকতা ও দরদি নৈতিকতা : ইমানুয়েল কান্টের দৃষ্টি আনুসারে একটি পর্যালোচনা

স্বর্ণালী অধিকারী [১]

নৈতিকতার ক্ষেত্রে যুক্তি (Reason)-র গুরুত্ব বেশি, না কি আবেগ (Emotion), অনুভূতি (Feelings), ভালোবাসা (Love), দরদ (Care) ইত্যাদির গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি ? এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্যে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে বিভিন্ন সময় মতপার্থক্য দেখা যায়। যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এমন দার্শনিকদের মধ্যে জার্মান দার্শনিক, ইমানুয়েল কান্ট ছিলেন আন্যতম। তিনি মনে করেন, কোন বিষয়ের নৈতিক বিচার ও বিতর্ক সম্ভব হতে পারে যদি এবং কেবলমাত্র যদি নৈতিকতার ভিত্তি সার্বজনীনতা (Universality) ও অনিবার্যতা (Necessity) র উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যথায় নৈতিকতার ক্ষেত্রে দরদ, আবেগ, অনুভূতির প্ররোচনা সমস্ত আলোচনাকে বিপথে চালিত করতে পারে।

AIJITR - Volume - 2, Issue - IV, Jul-Aug 2025

Copyright © 2025 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

অপরদিকে নারীবাদী দর্শনের অংশ হিসাবে বিকশিত দরদি নৈতিকতার সমর্থকগণ দাবি করেন, নৈতিকতার ক্ষেত্রে যুক্তিকে প্রয়োগ করে যে সার্বজনীনতা আমরা পাই তার বাস্তব জীবনে প্রয়োগক্ষেত্র অত্যন্ত জটিল। কেননা, কোন একটি আচরণ বিশুদ্ধ নৈতিকতার যৌক্তিক মানদণ্ড অনুসারে ত্রুটিহীন বলে মনে হতেই পারে, তবে বাস্তবে আদৌ ঐ মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা প্রমাণ করা দূরহ হয়ে উঠতে পারে বলে - কান্ট নিজেই তা স্বীকার করেছেন। বুদ্ধির সাহায্যে সার্বিক নিয়ম নির্ণয় করা গেলেও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির উপলব্ধি সর্বদা যুক্তি দিয়ে করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, সেক্ষেত্রে দরদ, আবেগ দিয়েই তা বোঝা সম্ভব হয়। তাই ন্যায়নীতির মানদণ্ডের দ্বারা বিচারের পাশাপাশি দরদ, আবেগ, সহমর্মিতা, বিচক্ষণতার প্রবণতাও নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

তাই আলোচ্য প্রবন্ধে আমি যেমন একদিকে দেখানোর চেষ্টা করব, যুক্তিভিত্তিক নৈতিকতা বলতে কান্ট কী বুঝিয়েছেন এবং তার এই নৈতিকতার মূল ভিত্তি কী, তেমনি অন্যদিকে দেখানোর চেষ্টা করব দরদি নৈতিকতার স্বরূপ এবং বর্তমান সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা। এই প্রসঙ্গে প্লেটোর দর্শন থেকেশুরু করে আধুনিক সময়ে দেকার্ত, কান্টের দর্শনে যে দ্বৈতবাদী মনোভাব বা Dualistic Structure দেখা যায় তা কতটা সমর্থনযোগ্য তাও তুলে ধরার প্রচেষ্টা করব, পাশাপাশি আমি দেখানোর চেষ্টা করব যদি যুক্তির দ্বারা নৈতিক নিয়মের মনদণ্ড স্থির

[১] *গবেষক, দর্শন ও জীবন-জগৎ বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, E-mail- swar.adhikary@gmail.com*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/2.IV.2025.43-50

AIJITR, Volume 2, Issue –IV, July - August, 2025, PP. 43-50
Received on 30th July 2025 & Accepted on 22nd, August, 2025 Published: 30th August, 2025.

করা হয় তাহলে আবেগ, দরদ, অনুভূতির কি নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব থাকবে? না কি থাকবে না ? না কি উভয়েরই প্রয়োজন হবে ?

কান্টের মতে, মানুষ হল এমন একটি প্রাণী যে অংশত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসম্পন্ন ও অংশত বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন। মানুষ যেহেতু সৃষ্ট প্রাণী এবং সৃষ্ট প্রাণী মাত্রই দেহযুক্ত, তাই বিশিষ্ট প্রাণীরূপে মানুষ কখনই ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করতে পারে না। আবার মানুষের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত বুদ্ধিবৃত্তি উপস্থিত থাকায় সে কখনই ইন্দ্রিয়সর্বস্ব ইতর প্রাণীর সমগোত্রীয়ও নয়। তাই তিনি বলেন, "Now man really finds in himself a faculty by which he distinguishes himself from everything else, even from himself as affected by objects, and that is Reason"[১]। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি (Reason) হল এমনই একটি ক্ষমতা, যে ক্ষমতাবলে মানুষ নিজেকে প্রত্যেক বস্তু বা বিষয় থেকে পৃথক করতে পারে, এমনকি সে যদি কোন বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সে নিজের থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারে।

আবার মানুষের মধ্যে স্থিত যুক্তি ও ইচ্ছাবৃত্তির নিরন্তর দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। কেননা দেখা যায়, আমাদের যেকোনো কাজের পশ্চাতেই থাকে ইচ্ছাবৃত্তি বা Will, তবে এই ইচ্ছাবৃত্তি যদি ফলাফলচিন্তা, লোভ, কামনা, পুরস্কারলাভের আশা প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে আমরা তাকে সৎ বলে গণ্য করতে পারিনা। কিন্তু যদি ইচ্ছাবৃত্তি (Will) শুধুমাত্র যুক্তি ও কর্তব্যবোধের দ্বারা চালিত হয়, কোন বাহ্যিক প্রভাব তথা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় বা সীমিত হয়, তখনই সেই ইচ্ছাবৃত্তি সৎ অর্থাৎ সদিচ্ছা (Good will) বলে পরিগণিত হয়। কান্ট এই সদিচ্ছাকে স্বয়ং মূল্যবান বলে মনে করেন। কারণ, এটি এমন একটি বিষয় যার নিয়ন্ত্রণ কর্তা সে নিজেই অর্থাৎ যার নিয়ন্ত্রণের ভার এবং নিয়ন্ত্রণের নিয়ম নিজের উপরেই নির্ভর করে থাকে, যা সম্পূর্ণভাবে শর্তনিরপেক্ষ। তাই কান্ট বলেন, "The only thing that is good without qualification or restriction is a good will"[২]. নৈতিকতার ক্ষেত্রে দার্শনিক কান্ট কর্মফলকে গুরুত্ব না দিয়ে সর্বদাই কর্মনীতিতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন, কর্তব্যবোধ দিয়ে মানুষের পরিচালিত হওয়া উচিত, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত হয়ে কর্তব্য সম্পাদন করা মানুষের নৈতিক কাজের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে

পারে, 'নৈতিককর্ম' বলতে কান্ট কী বুঝিয়েছেন ? এবং এরূপ নৈতিককর্মের মূল ভিত্তি কী বা কোন্ নৈতিক নিয়মের উপর নৈতিককর্ম নির্ভরশীল ? কান্ট বলেন, কোন কর্মের নৈতিক ভালত্ব, মন্দত্ব ঐ কর্মের দ্বারা উৎপন্ন সুখজনক বা দুঃখজনক ফলাফলের উপর নির্ভর করে না। একমাত্র সার্বভৌম নৈতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যদি কোন কাজ সম্পাদন করা হয়, তবেই সেই কাজের নৈতিক মূল্য থাকে। নৈতিক নিয়মকে হতে হবে সার্বজনীন ও আবশ্যিক। নৈতিকনিয়ম এমন একপ্রকার নিঃশর্ত অনুজ্ঞা (Categarical imparative) যা সকল মানুষকেই ঐ নিয়ম পালনের জন্য বাধ্য করে থাকে অর্থাৎ ধনী-নির্ধন, জ্ঞানী- অজ্ঞানী, ইতর-ভদ্র সকলেই এই নিয়ম পালনে বাধ্য। তাই কান্ট বলেন, "Act only on that maxim through which you can at the same time will that it should become a universal law"[৩]। অর্থাৎ এমন নিয়ম অনুসারে কর্ম সম্পাদন কর, যে নিয়মটিকে সার্বিক নিয়মে পরিণত করার ইচ্ছা তুমি পোষণ করতে পারো যাতে সেই নিয়ম অনুসারে যেকেউ কাজ করতে পারে। তিনি আরও বলেন, কোন প্রকার প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বা ভীতি, প্রীতি বা সহানুভূতির প্রেরণায় মানুষ যদি কোন ভাল কাজও সম্পাদন করে, তবে সে কাজটি প্রশংসার যোগ্য হলেও তাকে নৈতিকতার মানদণ্ডে মূল্যবান বলে গণ্য করা যাবে না। তাঁর মতে, কেবল নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যে কাজ সম্পাদন করা হয়, তাকেই নৈতিক কাজ বলা যাবে। কান্ট যে নৈতিক নিয়মের কথা বলেন, তা কোন ব্যক্তি, সমাজ, জাতি বা সংস্কৃতিকেন্দ্রিক নয়, সার্বিকভাবে সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আলোচ্য অংশে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিদানের দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞাটি বোঝার চেষ্টা করব। ধরা যাক, একজন ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন, যদিও তিনি জানেন ঋণ গ্রহণ করলে তা পরিশোধ করা তারপক্ষে সম্ভব নয়। তাও সে উপলব্ধি করেছে যে ঋণ

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সংগ্রহ করা ছাড়া তার কাছে অন্য কোন উপায়ও নেই। সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি মিথ্যা প্রতিশ্রুতিদানের মাধ্যমে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পর ঐ ঋণ পরিশোধ করবে বলে অর্থ ধার নিয়ে থাকে। এখন এই 'মিথ্যা প্রতিশ্রুতিদানের' নিয়মটি সার্বত্রিক হোক - তা কখনই চিন্তা করা যায় না। কেননা প্রত্যেকেই যদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি না রাখে তাহলে প্রতিশ্রুতির উপর মানুষ তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলবে এবং সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়াটাই বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং মিথ্যা প্রতিশ্রুতিদান অনুচিত কাজ। সুতরাং দেখা যায়, কান্ট নৈতিকতার ক্ষেত্রে সর্বদাই সার্বিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, কোন নিয়মকে সার্বজনীনরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কোন স্থান-কাল সংস্কৃতির সংশ্লিষ্ট ঘটনা, ব্যক্তি বিশেষ, অস্তিত্বশীল বিষয়, মানবসমাজ ও প্রকৃতির অনেক বিষয়কে অগ্রাহ্য করে তবে সার্বিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সংস্কৃতি, জাতি, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির ভিন্নতাবশতঃ ব্যক্তি মানুষের অবস্থান বিভিন্ন হয় এবং এই বিভিন্নতার মাঝে অভিন্ন সার্বিক নিয়ম নিতান্তই বিমূর্ত হয়ে পড়ে। ফলে সার্বিকনীতি প্রণয়নের ক্ষেএে পরিচর্যা, প্রীতি, মমতা, বিশ্বাস ইত্যাদি মনোভাবকে contextual, বিশেষ ক্ষেত্র বা শর্ত নির্ভর বিবেচনা করে বর্জন করা হয়। ফলে সার্বিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা এমন অনেক বিষয় সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়।

এই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে, Carol Gilligan (১৯৮০), Nel Noddings (১৯৮৪) এর মতো নারীবাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকগণ বিমূর্ত দ্বিমাত্রিক যুক্তিনির্ভর মূলধারার ন্যায়ভিত্তিক নৈতিকতার বিপরীতে দরদি নৈতিকতা (Care ethics)-র অবতারণা করেন। এক্ষেত্রে আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে দরদি নৈতিকতা কী ? দরদি নৈতিকতা নারীবাদী নৈতিক দর্শনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা নৈতিকতাকে মানবিক সম্পর্ক এবং পরিচর্যা বা যত্নের উপর ভিত্তি করে দেখে। এরা বিশ্বাস করেন যে, নৈতিকতা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এবং এক্ষেত্রে ভালো-মন্দ নির্ধারণের জন্য বা ন্যায়-অন্যায় নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনমত সামাজিক সম্পর্ক ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা প্রয়োজন। দরদি নৈতিকতার অনুশীলনগুলি মানুষের বেঁচে থাকা, বিকাশ এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অপরিহার্য, কেননা আমরা বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকেই নানারকমভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং এই নির্ভরতা আরও বাড়তে থাকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, অসুস্থতায়, মৃত্যুর অনিবার্যতারবোধে। এই তত্ত্বটি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক, আইন, রাজনীতি প্রভৃতির মতো বিভিন্ন পেশাদার ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

Carol Gillgan মনে করেন, মানুষের নৈতিক চেতনাকে বিচার করতে হলে, প্রচলিত যে নীতি-কাঠামো রয়েছে তার পরিবর্তে অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক নয়, সমরূপতাকে অগ্রাহ্য করে প্রত্যেকটি সমস্যাকে পৃথক পৃথকভাবে বোঝার চেষ্টা করে এবং যুক্তির মতো দরদ, আবেগেরও যে স্বতন্ত্র ভুমিকা নৈতিকতায় রয়েছে তা স্বীকার করে - এমন নতুন তত্ত্ব কাঠামোর প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, ভালোবাসা, দরদ, বেদনার মধ্যে দিয়ে আমরা সহজেই যেভাবে অপরকে বুঝতে ও জানতে পারি,

যুক্তিবিচার দ্বারা অপরকে তেমনভাবে সবসময় বোঝা সম্ভবপর হয় না। গিলিগান এখানে 'দরদ' বলতে 'Sympathy' এর পরিবর্তে 'Co-feeling' শব্দটি ব্যবহার করেন। কেননা Sympathy -র ক্ষেত্রে দুটি মানুষ উভয়ে উভয়ের প্রতি সমব্যাথা অনুভব করেন না - একজন অপরজনের প্রতি সমবেদনা বা সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু 'কো-ফিলিং' এমন একটি সংবেগ যেখানে প্রতিটি সম্পর্কিত ব্যক্তি একে অপরের প্রতি সহৃদয়ভাব অনুভব করেন। তারা মনে করেন পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই তাদের বিকাশ ঘটে, তাদের স্বরূপকে তারা খুঁজে পায়। মানুষের কোন অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ সামান্যধর্ম আছে বলেও গিলিগান স্বীকার করেন না। আবার তিনি এটাও স্বীকার করেন না যে, নারী-পুরুষের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনে কোন জৈবিক পার্থক্যের ভিত্তি আছে। বরং তিনি অতীত পর্যালোচনা করে দেখান, যেখানে প্রায় সর্বত্র প্রজননের ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর নারী ও পুরুষের লিঙ্গ-বৈষম্য (Gender discriminatiom) নির্ভর করে। লিঙ্গ বা

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Gender হল একটি সামাজিক গঠন (Gender is a social construction) বা বলা যায়, একজন নারী বা পুরুষের আচরণ কেমন হবে বা অন্যদের সাথে সে কেমন ব্যবহার করবে যখন তা সমাজ দ্বারা নির্ধারিত হয় তখন তাকে লিঙ্গ বলে। তাই বলা যায়, সমাজের দ্বারা নির্ধারিত প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে আচরণগত যে প্রভেদ সৃজিত হয় তাকে লিঙ্গ-বৈষম্য বা Geder discrimination বলে। সমাজ সাধারণভাবে নারীকে সেবা ও মমতার দায়িত্ব অর্পণ করে। কেননা, পরিবার তথা সমাজে নারীর বিভিন্ন মানুষের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব যেমন - মাতৃত্বের, সন্তান প্রতিপালন, বয়স্কদের দেখাশোনা, পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব, সহমর্মিতা, সমাজের অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক সাধন ইত্যাদি ভূমিকা ক্রমাগত পালন করার ফলে নারী সচারচার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের, প্রতিযোগিতার ও অধিকারের দাবি তোলে না। তবে এটি তার কোন দুর্বলতা নয়, বরং দীর্ঘদিনের অর্জিত অভ্যাস। নারী ক্রমাগত এই দায়িত্ব পালন করার ফলে সে সামাজিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও লালন এই তিনটির মধ্যে যে গভীর পারস্পারিক সম্পর্ক আছে তা সে উপলব্ধি করেছে এবং এটির নৈতিক মূল্যকে ব্যক্তির অধিকার বা নিরপেক্ষ বিচারের দাবীর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে।

অন্যদিকে আবার দেখা যায় যে, দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট তাঁর Groundwork of the Metaphysics of Morals গ্রন্থে Practical Love ও Pathological Love এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং উভয়ের

মধ্যে পার্থক্যও দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, "…..we are Commanded to love our neighbour and even our enemy. For love out of inclination cannot be commanded; but kindness done from duty - although no inclination impels us, and even although natural and unconquerable disinclination stands in our way - is practical, and not pathological, love, residing in the will and not in the propensions of feeling, in principles of action and not of the melting compassion; and it is this practical love alone which can be an objective of command"৪। অর্থাৎ আমাদের প্রতিবেশীকে, এমনকি আমাদের শত্রুকেও ভালবাসার জন্য আদেশ করা হয়েছে। কারণ প্রবণতা থেকে ভালবাসার আদেশ দেওয়া যায় না। তবে কর্তব্য থেকে দয়া বা সহানুভূতি সংগঠিত হয় - যদিও কোন প্রবণতা আমাদের প্ররোচিত করে না, এমনকি যদিও প্রাকৃতিক এবং অদম্য বিড়ম্বনা আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করে - তবুও কর্তব্যের জন্য অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। এটিই হল practical love, pathological love নয়, যে ভালোবাসা ইচ্ছাতে নিহিত থাকে, অনুভূতির প্রবণতাতে নয়, আবার কর্মের নীতিতে থাকে কিন্তু দয়াশীলতার নীতিতে নয় এবং একমাত্র এই Practical love ই আদেশের বিষয়বস্তু হতে পারে। আবার ইন্দ্রিয় উদ্ভূত ভালোবাসা (লোভ, মোহ, কামনা ইত্যাদি) বা সহজাত সহানুভূতিকে কান্ট Pathological love বলে গন্য করেছেন। স্পষ্টতই এক্ষেত্রে মনে করা যায় যে, Practical love -ই কান্টের মতে নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু Pathological love যেহেতু সম্পূর্ণ আবেগ থেকে উৎপন্ন তাই নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে এটি প্রাসঙ্গিক নয়।

গিলিগানের মতানুসারে দরদি, আবেগপ্রবণ হওয়া কোন দুর্বলতা নয়, বরং এটি আদর্শগতভাবে পরিণত এক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তিনি বিশ্বাস করেন, অন্ধ কঠোর নিয়মতন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমেই পরিণত নৈতিকবোধ উপলব্ধ হয় না। একথা বলার কোন মানে নেই যে, একজন ব্যক্তির মধ্যে তখনই নৈতিকবোধের বিকাশ ঘটবে যখন সে সার্বিক নৈতিক আদর্শগুলিকে যুক্তিসহকারে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। বরং বাস্তবজীবনে দেখা যায়, কোন একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আদর্শ নৈতিক মতবাদ তখনই প্রতিফলিত হয় যখন বিচারপ্রার্থী তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধ অনুভূতিগুলি সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় এবং বিচারকর্তা সেই পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী

ন্যায্যতার বিচার করে। সুতরাং এক্ষেত্রে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে নিজের ও অপরের চিন্তাকে সামাজিক ও অপরের আবেগময় অনুভূতির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে এবং প্রতিটি বিশেষ প্রেক্ষাপট ও

পরিস্থিতি যাচাই করতে হবে। তাই বলা যায়, কোন বিষয়ে নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে আত্মার (কর্তার) সংযুক্তিকরণ নৈতিকতাকে আরও বেশি করে মানবিক করে তুলতে পারে- এই বিষয়ে উপলব্ধির কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতাতেও পাই। এই প্রসঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তার স্ত্রী গান্ধারীর উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে দেখা যায়, গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন -

"………প্রভু, দণ্ডিতের সাথে

দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ

কোন ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান

প্রবলের অত্যাচার। ………………."[৫]

সুতরাং দেখা যায়, নৈতিকতার ক্ষেত্রে কিছু সার্বত্রিক নিয়মের সমষ্টির পরিবর্তে যদি দরদ, আবেগ, মানবিক অনুভূতি, পারস্পারিকতাবোধ প্রভৃতির দ্বারা সন্মিলিতভাবে মানদণ্ড গড়ে তোলা যায় এবং তা যদি সতর্কভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে সমগ্র মানবজাতি তথা সমগ্র সমাজের উন্নয়ন সাধন করবে বলে আশা করা যায়।

আবার এই সমাজ আমাদের শিখিয়েছে যে, যুক্তি-বুদ্ধি (Reason) এবং আবেগ (Emotion) এই দুইয়ের মধ্যে যোজনব্যাপী পার্থক্য রয়েছে। প্লেটো-র দর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক সময়ে দেকার্ত, এনলাইটমেন্টের যুগে কান্টের দর্শনে এমনকি বর্তমান সময়েও আমরা এই দ্বৈততা (Dualism) লক্ষ্য করে থাকি। দ্বৈতবাদী এই বিপরীতধর্মী মনোভাবের জন্যই নারী-পুরুষ (Male/Female), সার্বিক-বিশেষ (Universal/Particular), বুদ্ধি-আবেগ (Reason/Emotion), মানব-প্রকৃতি (Human/Nature), নিজ-অপর (Self/Other), জনসাধারণ-ব্যক্তিগত(Public/Private) প্রভৃতি সমাজে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে সমাজ ও সংস্কৃতিতে অপ-মূল্যবোধের জন্ম নেয়। তবে এর মূলে রয়েছে পিতৃতন্ত্রের কৌশলী মানসিকতা। এক্ষেত্রে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, দরদি নৈতিকতার সাথে পরিবেশনারীবাদী তত্ত্বের একটি সাদৃশ্য রয়েছে, যদিও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বিদ্যমান। কেননা, দরদি নৈতিকতার সমর্থকদের মতো পরিবেশনারীবাদী (Ecofeminism) দার্শনিকগণও যেমন - Val Plumwood, Karren J. Warren, গভীর বাস্তুবাদী দার্শনিক Arne Naess ও প্রমুখরা স্বীকার করেন যে, মূলধারার পরিবেশ নীতিতত্ত্ব বা পরিবেশনারীবাদী তত্ত্বও Logic of domination বা কর্তৃত্বের যৌক্তিকতার ধারণা দ্বারা অবদমিত। পরিবেশনারীবাদীরা নারী ও প্রকৃতির মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান আছে বলে তাঁরা স্বীকার করেন, আবার পুরুষতন্ত্র নারী ও প্রকৃতিকে সমগোত্রীয় বলে গণ্য করে উভয়কে "অপর" (other) বলে আখ্যায়িত করে তাদেরকে নিম্নমানের বা কমমর্যাদাসম্পন্ন বলে দাবি করেন। তাই দরদি নৈতিকতার সমর্থগণ ও পরিবেশনারীবাদী দার্শনিকগণ উভয়ই 'পীড়নমূলক ধারনাগত কাঠামো'(Oppressive Conceptual Framwork)-র বেড়াজালকে নস্যাৎ করতে চান, যাতে নারীরা তাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতি সাধন করতে পারেন, তাদের নিজস্ব বক্তব্য স্বাধীনভাবে বলার অধিকার তারা পান।

আবার যুক্তি (Reason)-কে মানসিক (mental), সার্বজনীন (universal), পাবলিক (public) রূপে গণ্য করে কেবল পুরুষের গুণ বলে বিবেচিত করা হয়েছে এবং যেখানে নারীকে দেখান হয়েছে আবেগময়ী রূপে। যুক্তি জ্ঞান এবং সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে তা উচ্চস্তরের এবং আবেগ নিয়ত পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলে তা নিম্নস্তরের। নারী যেহেতু জীবনকে সৃষ্টি করে ও পালন করে তাই দেহের সঙ্গে বা জৈবিক প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি। এইভাবে নারী ও পুরুষকে বিপরীত গুণে ও বৈষম্যে ভূষিত করার চেষ্টা প্রায় সকল পুরুষতান্ত্রিক সমাজেই দেখা যায়। এমনকি দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের বক্তব্যেও নারীর প্রতি যে তাঁর বৈষম্যমূলক মনোভাব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁরই লেখা 'Observations on the Feeling of the Beautiful and sublime' গ্রন্থে। তিনি বলেন, "A woman is embarrassed little that she does not possess certain high insights, that she is timid, and not fit for serious employments, and so forth; she is beautiful and capitavates, and that is enough"[৬]। অর্থাৎ নারীরা ভীত, তাদের কোন উচ্চপর্যায়ের জ্ঞান নেই, তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজের যোগ্যও নয় - যারজন্য তাদের কোন লজ্জাবোধও নেই। তিনি আরও বলেন, নারীরা সুন্দর, তারা মুগ্ধ করে এবং সেটাই যথেষ্ট। দার্শনিক অ্যারিস্টটলও বলেন, মানুষ (পুরুষ) সক্রিয় এবং নারী নিস্ক্রীয় (Man is active and woman is passive).

এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে, নারী ও পুরুষের পরিচয় যেভাবেই দেওয়া হোক না কেন, 'মানুষ যুক্তিশীল জীব' - এটিই তার একমাত্র লিঙ্গ-নিরপেক্ষ পরিচয়। ক্যারল গিলিগান মনে করেন নারীর

নৈতিক বিকাশের মূল মন্ত্রই হল নিজস্ব সত্তা (Self) ও অপর (Other) এর মধ্যে সম্পর্কের বেড়াজালকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া। কেননা কোন সত্তার পক্ষেই অপরকে বাদ দিয়ে সমাজে সুষ্ঠভাবে বাঁচা সম্ভব নয়। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত 'In a Different Voice' গ্রন্থে গিলিগান দেখান যে, আমাদের সমাজে 'পিতৃতন্ত্রের কণ্ঠস্বর'(patriarchal voice) ছাড়াও অপর একটি কণ্ঠস্বর আছে তা হল Different voice বা ভিন্ন স্বর। প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যমকে সাধারণতঃ 'স্বর' বলে। কিন্তু গিলিগান এক্ষেত্রে বর্ণনা ও রূপক এই উভয় অর্থেই 'স্বর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন - যার মাধ্যমে নারী পরস্পরের সাথে সংযোগসূত্রকে সংরক্ষন করার চেষ্টা করে। ১৯৯৩ সালে 'In a Difference Voice' গ্রন্থের শুরুতেই 'Letter to Readers' অংশে গিলিগান 'স্বর' (voice) সম্পর্কে বলেন - "I say that by voice I mean something like what people mean when they speak of the core of the self. Voice is natural and also cultural. It is composed of breath and sound, words, rhythm, and language. And voice is powerful psychological instrument and channel, connecting inner and outer worlds"[৭]। অর্থাৎ 'স্বর' বলতে আমি (গিলিগান) বোঝাতে চাই এমন কিছু যা একজন মানুষ তার সত্তার অন্তস্থল থেকে বলতে চায়। স্বর স্বাভাবিক ও সাংস্কৃতিক ও বটে। এই স্বর গঠিত হয়েছে নিঃশ্বাস, আওয়াজ, শব্দ, ছন্দ ও ভাষার সংমিশ্রণে। তিনি আরও মনে করেন এই স্বর হল আর্ন্তজগৎ ও বর্হিজগৎের মধ্যে সংযোগ সংস্থাপনকারী একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু যৌক্তিক, নিয়মকেন্দ্রিক কিংবা বস্তুবাদী বিচারব্যবস্থা যে এই স্বরের প্রতি উদাসীন ছিলেন তা গিলিগান উপলব্ধি করেছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এই 'Different' বা 'ভিন্নতা' কে, 'deviance' বা বিচ্যুতি হিসাবে দেখে। কেননা তারা মনে করেন, যারা 'ভিন্ন স্বর' ব্যবহার করছেন তারা আসলে তথাকথিত নিয়মব্যবস্থার সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছেন না, এটি তাদের একপ্রকার অক্ষমতা। কিন্তু গিলিগান তার গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন যে 'ভিন্নতা' মানে কোন বিচ্যুতি বা অক্ষমতা নয়। বরং যোগাযোগমূলক বা পারস্পারিকতামূলক স্বর হিসাবে 'ভিন্ন স্বর' কে তিনি স্বীকার করেছেন, যা উচ্চারনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার নিজস্ব পরিস্থিতি বা অবস্থার কথা নিঃসংশয়ে, স্বাধীনভাবে বলতে পারে। সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে নারীকে তার স্বতন্ত্রতা, স্বাভিমান

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুবই কম দেওয়া হয়, এমনকি যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সে বড়ো হয়ে ওঠে সেখানে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালো লাগা, মন্দ লাগা কিংবা দাবিদাওয়া প্রতিষ্ঠার সুযোগ যেহেতু

কম থাকে, তাই নারীরা পরিবারের মধ্যে থেকে আলোচনার মাধ্যমেই সম্পর্কে পরিবর্তন আনতে চায়, বেরিয়ে যাওয়ার (Exit) বিকল্পটি সে খুব সহজেই বেছে নেয় না। কিন্তু পুত্রসন্তানরা যে পারিবারিক বা সামাজিক পরিকাঠামোতে শৈশব থেকে বড় হয়ে ওঠে সেখানে সে তার স্বতন্ত্রতা, স্বাভিমান প্রতিষ্ঠার সুযোগ সে পায়, ফলে কোন অবস্থা বা ঘটনার বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করার জন্য সে সহজেই বেরিয়ে আসার (Exit) পথ নির্বাচন করতে পারে।

গিলিগান মনে করেন, যুক্তিভিত্তিক নৈতিকতা বা ন্যায়ভিত্তিক নৈতিকতা যে সার্বিকতা, যৌক্তিকতা, নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের কথা বলে তা পুরুষতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত। কিন্তু দেশ-কাল বর্হিভূত কোন নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ সম্পর্ক হয় না। সম্পর্ক পারস্পারিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে গড়ে ওঠে, প্রয়োজনে তা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়।

আবার দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বলেন, নৈতিকতার ক্ষেত্রে নৈতিক বিচার ও বিতর্ক সম্ভবপর হবে যদি নৈতিকতার ভিত্তি সার্বজনীনতা ও অনিবার্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর মতে, নৈতিক নিয়ম এমন একপ্রকার নিঃশর্ত অনুজ্ঞা যা সকল মানুষকে ঐ নিয়ম পালনের জন্য বাধ্য করে থাকে। যেমন- ‘মিথ্যা কথা বলা অনুচিত’ - এই নৈতিক নিয়মটি সার্বিকভাবে প্রযোজ্য বলে কান্ট মনে করেন এবং কোন নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে বলে তিনি মনে করেন না। আলোচ্য অংশে আমি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব যে, কান্ট প্রদত্ত ঐ নৈতিক নিয়মটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা সম্ভব নয়, কারণ সেক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বিষয়টিকে উপস্থাপনা করার জন্য আমি বিমলকৃষ্ণ মতিলালের ‘নীতি, যুক্তি ও ধর্ম’ গ্রন্থ থেকে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছি। কৌশিক নামে এক মুনি তপোবনে তপস্যা করছিলেন। যিনি সর্বদা সত্যকথা বলার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সমস্যা হল একদিন, কিছু নিরীহ পথিক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাদেরকে দেখে একদল দস্যু তাদের হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের অনুসরণ করেন। এমতাবস্থায় নিরীহ পথিকরা কৌশিক মুনিকে ঐ পথে দেখতে পেয়ে বলেন, আমরা প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছি, যদি দস্যুরা এই পথে আসে তাহলে আপনি তাদেরকে অন্য পথ দেখাবেন। কিন্তু কৌশিক মুনি যেহেতু সত্যকথা বলার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তাই দস্যুরা যখন তাঁকে পথিক কোন পথে গিয়েছে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি সত্য কথাই তাদের বলে দেন। এই পরিস্থিতিতে কৌশিক মুনির মিথ্যা কথা না বলার জন্য অর্থাৎ সত্য কথা

বলার জন্য নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটল। শ্রীকৃষ্ণ এক্ষেত্রে বলেছিলেন কৌশিক মুনির মৃত্যুর পর তাঁর চিরকাঙ্খিত স্বর্গে তিনি যেতে পারেননি বরং নরকেই তাঁর ঠাঁই হয়েছিল। কেননা, সত্যরক্ষা বা প্রতিজ্ঞারক্ষার চেয়ে নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করা অনেক বড় ধর্ম। তাই সত্যের চেয়ে মিথ্যাই এখানে ধর্ম হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আমি এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, সর্বদা ন্যায়নীতির মানদণ্ডের দ্বারা বিচার না করে, বরং তার পাশাপাশি পরিস্থিতি অনুযায়ী দরদ, সহমর্মিতা, বিচক্ষণতার প্রবণতাও নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে সবসময় প্রয়োজন।

অপর একটি দৃষ্টান্তও এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে, ধরা যাক, একজন মানুষ দূরারোগ্য ব্যধিতে দীর্ঘদিন ধরে আক্রান্ত, যার সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এই অবস্থায় তার কাছে দুটি পথ খোলা আছে - হয় তাকে আমৃত্যু পর্যন্ত রোগের এই অসহনীয় যন্ত্রণা বা কষ্ট ভোগ করতে হবে অথবা তাকে আত্মহত্যা করতে হবে। এক্ষেত্রে কান্ট বলবেন, আত্মহত্যা অনৈতিক, কেননা এটি নিঃশর্ত অনুজ্ঞার নৈতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে। এক্ষেত্রে নিয়মটি হল - “ Act in such a way that you always treat humanity, whether in your

own person or in the person of any other, never simply as a means, but always at the same time as an end"[৮]। অর্থাৎ এমনভাবে কাজ কর যাতে তুমি সর্বদা মানবতার সাথে আচরণ করতে পার, তা তোমার নিজের কোন ব্যক্তিই হোক বা অন্য যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেই হোক না কেন, সর্বদা তাকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, কখনই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়রূপে নয়। কিন্তু দরদি নৈতিকতার সমর্থকগণ এরকম কোন সার্বজনীন নিয়মের কথা বলেন না। কেননা তারা মনে করেন, কোন সার্বজনীন নিয়ম স্বীকার করে নিয়ে, পরিস্থিতি বিচার না করে তা প্রয়োগ করা যথোপযুক্ত নয়। কেননা প্রত্যেকটা পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন, তাই এই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিন্ন সার্বত্রিক নিয়ম প্রয়োগ নৈতিকতার ক্ষেত্রটিকে সীমিত করেদিতে পারে। তাই এই অবস্থায় আমাদের পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে ঐ দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য কোন পথটা অনুসরণ করা শ্রেয়, যদিও এক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। তাই পরিশেষে বলা যায়, কান্টের যুক্তিভিত্তিক নৈতিকতা হোক কিংবা নারীবাদী দর্শনের অংশ হিসাবে বিকশিত দরদি নৈতিকতাই হোক - উভয়েরই প্রধান দাবি সুবিচার। যদিও তাদের যৌক্তিক মানদণ্ড ও উপস্থাপন রীতিও ভিন্ন ভিন্ন তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে,

নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে যুক্তি (Reason)-র ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। কেননা সমাজের যেসব ক্ষেত্রগুলিতে অবিচারের নানা ফাঁকফোকর আছে তা চিহ্নিত করার জন্য যুক্তি অনস্বীকার্য। আবার তার পাশাপাশি যদি আমরা নৈতিকতার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী দরদ, আবেগ, অনুভূতিকে সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে নৈতিকতার পরিসর ব্যাপকতর হবে বলে আমরা আশা করতে পারি। তাই আমরা যেমন বলে থাকি Man and woman are two part of the same coin, ঠিক একইরকমভাবে বলতে হয় Reason and Emotion are two part of the same coin.

তথ্যসূত্র :

১. Abott, T.K, Kant's Critique of Practical Reason and other Works on the theory of Ethics, Longmans, Green & Co., Paternoster -Row, London, 1889 (4th edition), p.g.- 71.

২. Paton, H.J, Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals, Hutchinson & co., London, 1958 (3rd edition, reprint), p.g.- 17.

৩. ibid, p.g. - 30

৪. ibid, p.g. - 67

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ২০২২ (অষ্টম সংস্করণ), পৃষ্ঠা -১৫২

৬. C/F- মৈত্র, শেফালী, নৈতিকতা ও নারীবাদ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা -৩১

৭. Gilligan, Carol, In a Different Voice, Harvard university press, England, 2003(38print), p.g.-xvi.

৮. Paton, H.J, Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals, Hutchinson & Co., London, (3rd edition,reprint) 1958, p.g.- 96.